প্রথম অধ্যায়

প্রাগ্‌ভাষ

সাহিত্যের সকল শাখাই যে যুগের ফসল একথা আজ সকলেরই জ্ঞাত সত্য। কিন্তু সময় বলতে কোন সময়? এর তো নানা মাত্রা। একটি ক্ষণকাল, আরেকটি শাশ্বত সময়। সংবেদনশীল পাঠক মাত্রেরই জানা যে ক্ষণকালের মধ্যে দাঁড়িয়ে লেখকের জীবনোপলব্ধি ঘটে, সেই উপলব্ধিই সাহিত্য উৎকীর্ণ হয়। আবার নির্দিষ্ট দেশকাল লগ্ন না থেকেও একটি রচনায় চিরকালের কথা কোনো এক আশ্চর্য কৌশলে গাঁথা হয়ে যায়। এই জন্যই গ্রীক পুরাণের পাখির মতোই সাহিত্যের দুটি মুখ। একটি সমকালে নিবিষ্ট। অন্যটির অভিমুখ সুনীল আকাশের অপার অপরিমেয়তায় প্রসারিত। তাই কোনো লেখকের পাঠকৃতির আলোচনায় এই দুটি পরিসরের আলোচনাই আবশ্যিক হয়ে পড়ে। তবে সময় যেহেতু বিমূর্ত ও জটিল, সেজন্য এই একই সময়ের মধ্যে নানারকম বিভক্ত ও ঘূর্ণাবর্ত থাকাটাই স্বাভাবিক। একজন লেখকের চরম সিদ্ধি হয়তো তখনই ঘটে, যখন তিনি বহুমাত্রিক সময়ের এই দ্বান্দ্বিকতাকে খুব সূক্ষ্মভাবে তাঁর সাহিত্যকর্মের ভেতর প্রয়োগ করতে পারেন। লক্ষ করলে দেখা যাবে এই সময়বোধের পার্থক্যই লেখকদের একে অপরের থেকে পৃথক করে তোলে।

সার্থক বাংলা ছোটগল্পের জন্ম হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতেই, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ‘সাহিত্য’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ছোটগল্পের আলোচনা তখন মশগুল থাকতো। চেকভ, মোপাসাঁ প্রভৃতি ছোটগল্পকারদের গল্প তখন বাংলা পত্র-পত্রিকায় অনুবাদের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে পাঠকের কাছে। পাঠকের কাছে নিত্য বেড়ে চলল ছোটগল্পের আকর্ষণ। সাময়িক পত্রিকায় ছোটগল্পের চাহিদা ক্রমশই বেড়ে চলল। এমনই অবস্থার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের জন্য লেখনী ধারণ করলেন। ‘হিতবাদী’, ‘সাধনা’, ও ‘সবুজপত্র’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গল্পকার রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সত্তার বিকাশ।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ‘ভারতী’, ‘নবজীবন’, ‘বালক’ পত্রিকাতেও গল্প লিখেছেন। ১৮৯১ থেকে ১৮৯৫-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ চুয়াল্লিশটি গল্প লিখেছেন পত্রিকার তাগিদে। ছোটগল্পের আঙিনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মের জগতের সঙ্গে সাহিত্যের যোগসাধন করেছিলেন। যদিও ১৮৭৩ থেকে ১৮৯১ সালের মধ্যে বেশকিছু পত্র-পত্রিকার চাহিদানুসারে বাংলা ভাষায় প্রথম ছোটগল্প রচনার একটা সযত্ন প্রয়াস লক্ষ করা গেছে। যেমন পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘মধুমতী’, সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘রামেশ্বরের অদৃষ্ট’, ‘দামিনী’, গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘হাবা’, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘ললিত ও সৌদামিনী’ প্রভৃতি ছোট আখ্যানের মধ্যে আধুনিক ছোটগল্পের সংজ্ঞার্থে না হলেও ছোটগল্প নির্মাণের একটা প্রচেষ্টা এইসব আখ্যানের মধ্যে ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর যে সমস্ত লেখকদের হাতে ছোটগল্প নতুন প্রাণ পেয়েছিল তাঁরা হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার, পরশুরাম, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ। তবে বাংলা ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে কল্লোল যুগের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কল্লোলদের হাত ধরেই সেসময় ছোটগল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে আর একটা নতুন পর্বের সূচনা হতে দেখা গেছে। তাঁরা ছোটগল্পের ভেতরে বাস্তবতার উপাদান প্রবেশ করাতে তৎপর ছিলেন। কিন্তু তাঁদের এই বাস্তবতার ভেতর কতোটা দেশীয় বাস্তবতার শিকড়ের সন্ধান ছিল আর পাশ্চাত্য থেকে আমদানিকৃত ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রক্ষেপ ছিল কতোটা, এ বিষয়ে বিতর্ক থেকেই যায়। যদিও সেসময় তিন বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থাৎ মানিক, তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ নিজের নিজের মতো করে গল্প লিখে বাংলা ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন, গৌরবান্বিত করেছেন। পাশাপাশি সুবোধ ঘোষ, জগদীশ গুপ্ত প্রভৃতি অনেক গল্পকাররাই গল্প লিখেছেন। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পর দেশভাগের পরিণাম নিয়ে বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে আর একটা নতুন পর্বের সূচনা হতে পারতো কিন্তু দেশভাগ নিয়ে সেই অর্থে কোনো লেখাই তৈরি হল না। পঞ্চাশের দশকের লেখকদের সামনে দেশভাগ ছিল, দাঙ্গা ছিল, মানুষের গৃহচ্যুত ছিল অথচ দেশভাগের করুণ যন্ত্রণা নিয়ে বড় কোনো লেখা তৈরি হল না। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে বাঙালির কাছে দেশভাগ কেনো বেদনার হল না? হয়তো বাঙালি মধ্যবিত্ত বা

তথাকথিত উচ্চবর্ণের যে লেখকরা ছিলেন তাঁরা ভেবেছিলেন মার্কেট বা বাজার যা চাইবে তাই আমরা লিখবো। সমরেশ বসুর মতো লেখকও কিন্তু লিখলেন না দেশভাগ নিয়ে। কমিউনিস্ট পার্টি ও যৌনতা নিয়ে লিখলেন 'বিবর', 'প্রজাপতি', 'নয়ানপুরের মাটি' অথচ দেশভাগ লিখে লিখলেন না। একমাত্র ঋত্বিক কুমার ঘটক তাঁর সারাজীবনের ফিল্ম অভিযানে পাগলের মতো বঙ্গভঙ্গের কথা বলে গেছেন, বঙ্গভঙ্গের জন্য তাঁর বেদনা তীব্র। সেটা 'কোমল গান্ধার' হতে পারে, সেটা 'সুবর্ণরেখা' হতে পারে, 'মেঘে ঢাকা তারা' হতে পারে, 'যুক্তি তক্ক' হতে পারে, সমস্ত গল্পেই তিনি বলেছেন দেশভাগের কথা, কাঁটাতারের কথা, বাঙালির অসীম যন্ত্রণার কথা। পঞ্চাশের লেখকদের কাছে মূলত যৌনতাটাই বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। তবে পঞ্চাশের শেষ দিকে নতুন আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হতে দেখা যায়, যা ষাটের দশকেও ছিল। ১৯৫৯ সালে বিমল কর ছোটগল্পের একটি সিরিজ বের করেছিলেন, যার নাম ছিল 'ছোটগল্প : নূতন রীতি'। অর্থাৎ এর মাধ্যমে পূর্বে প্রচলিত তথাকথিত গল্পের যে রীতি ছিল সেটাকে ভেঙে ফেলার একটা চেষ্টা লক্ষ করা গেছে। 'গল্প' কথাটির যে প্রচলিত ব্যাখ্যা ছিল সেই ব্যাখ্যাকে তাঁরা সমর্থন করলেন না। গল্পহীন গল্প রচনার একটি সাহসী প্রয়াস তাঁরা নিয়েছিলেন, যদিও এই নতুন রীতির ছোটগল্প নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও দৈনিকে। তবে সেসময়ে ব্যক্তি বিশেষে কিছু কিছু গল্পকার কয়েকটি অসাধারণ ছোটগল্পের জন্ম দিয়েছেন একথা যেমন সত্য, তেমনই বাংলা ও বাঙালির আর্থ-সামাজিক জীবন বিন্যাসে যে হতাশা, জটিলতা ও উৎকণ্ঠার জন্ম হয়েছিল সেসময়, তার স্পষ্ট ছবি লিপিবদ্ধ করতে পারেননি গল্পকাররা একথাও সমান সত্য। একারণেই হয়তো বলা হয়ে থাকে বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশক ছোটগল্পের নতুন পর্ব নিয়ে হাজির হয়েছিল। কারণ সবচাইতে বেশি বৈচিত্র্য সত্তরের লেখকরাই নিয়ে এসেছিলেন। নকশাল আন্দোলন কিংবা বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর পঞ্চায়েত যে রূপ পরিগ্রহ করে সেই রূপ, ভূমি সংস্কার, ভূমি আন্দোলন, ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন, যুক্তফ্রন্ট, নকশাল আন্দোলন ভেঙে যাওয়া, ধর্মের নামে যারা দেশকে নষ্ট করতে চায় সেই বিষাক্ত শক্তির উত্থান এবং প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে অজস্র রচনা এই

লেখকেরাই করেছেন। এঁদের ভ্যারাইটি সবচাইতে বেশি। মূলত যাঁরা বড়ো কাগজের বাইরে লিখলেন তাঁরাই এই ভ্যারাইটিকে লালন করলেন। হোমোসেক্সুয়ালিটি এলো, লেজবিয়ানিজম এলো, তারাশঙ্করের 'হাঁসুলিবাকের উপকথা'য় যদিও তৃতীয় লিঙ্গের নসুবালা চরিত্র আছে— এই তৃতীয় লিঙ্গের বিষয়টিও কিন্তু আমাদের সত্তরের লেখকরাই আবিষ্কার করলেন। ফলে এই গোটা ব্যাপারটা নিয়েই একটা বড় অভিযান গঠন করলেন তাঁরা। সত্তরের দশক বাংলা ছোটগল্পের ভেতর এক পর্বান্তরের সূচনা করেছিল এবং সেটা সম্ভব হয়েছিল ষাট ও সত্তরের দশকে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়নের ফলে উদ্ভূত নতুন জীবন জিজ্ঞাসার ফলে। পঞ্চাশের লেখকদের সামনেও এতো ভ্যারাইটি ছিল না। তিরিশের দশকের তো ছিলই না। যদিও তিরিশে মন্বন্তর এসেছে, যুদ্ধ এসেছে কিন্তু তিরিশের লেখায় সেভাবে যুদ্ধ আসেনি। ইউরোপ যে ভয়াবহতার কথা দেখিয়েছেন তাঁদের লেখায়, আমাদের বাঙালি লেখকরা সেভাবে দেখাতে পারেননি। কলকাতার নিষ্প্রদীপ রাত, সাইরেন, মানুষের ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া, বোমার ভয়, ব্ল্যাক মার্কেট, নিরন্ন মানুষের ফ্যান দাও ফ্যান দাও বলে চিৎকার—এসব গল্পে কিন্তু সেভাবে আসেনি। বিচ্ছিন্নভাবে হয়তো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু কিছু লিখেছেন, বিভূতিভূষণ 'অশনি সংকেত' লিখলেন কিন্তু ব্যাপকভাবে যে দাঙ্গা, দেশভাগের যে আলোড়ন, সেই আলোড়ন কিন্তু ফুটে উঠলো না। তাঁরা তাঁদের মতো করে একটা ভূমি তৈরি করলেন। সত্তরের লেখকদের লেখায় নকশাল আন্দোলন, দেশভাগ এসবই নতুন করে পুনর্জাগরিত হয়ে এসে পৌঁছেছে। আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম যেহেতু 'আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ছোটগল্প (১৯৬০-১৯৮০)' সেকারণেই দেখে নেওয়া যাক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং ছোটগল্প নির্মাণের দিক থেকে কেমন ছিল এই কুড়ি বছরের সময়সীমা।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা বৈপরীত্যময় ঘটনার সমাবেশে ষাট-সত্তরের দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'উদ্বাস্তু' জনজোয়ার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, শ্রমিক আন্দোলন, নানা

রাজনৈতিক টানাপোড়ন, দ্বিধা-ত্রিধা বিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, ভারত-চিন সীমান্ত সংঘর্ষ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ষাটের দশকের সূচনা হয়েছিল। আবার মুক্তি সংগ্রাম, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, আশা, আশাহীনতা, আনন্দ ও বিষাদে সত্তরের দশক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই উত্তাল ষাট ও সত্তর অর্থাৎ এই কুড়ি বছরের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে বিষয় হিসেবে বেছে নিয়ে অনেক কবি-সাহিত্যিকরাই কলম ধরেছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেলো ঠিকই, তবে এই রক্তপাতহীন দ্বিধা বিভক্ত স্বাধীনতার স্বাদ অনেকের কাছেই মিথ্যে মনে হতে থাকলো, কেননা 'উদ্বাস্তু' জনজোয়ারে ভাঙা বাংলা তখন টালমাটাল। পাশাপাশি খাদ্য সংকট তীব্র। সেই সঙ্গে ছিল নানা রাজনৈতিক টানাপোড়ন। ষাটের দশকেই ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে পরপর দুবার বিধানসভার নির্বাচন হয়েছিল এবং সেই নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস ভেঙে পড়ে, গঠন করা হয় বাংলা কংগ্রেস। বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বেও মিলিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের (প্রথম ও দ্বিতীয়) পতন হতে দেখা যায় ও শুরু হয় রাষ্ট্রপতি শাসন। হাজার হাজার মেধাবী ছাত্রের চোখে বিপ্লবের স্বপ্ন ব্যর্থ হল। যুব সন্ত্রাস আন্দোলন, রাষ্ট্রপতি শাসন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ষাটের দশকের উত্তাল জনজোয়ার, জনসংগ্রাম যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই গুরুত্বপূর্ণ পূর্বের কংগ্রেসি মন্ত্রীসভার সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভার গুণগত পার্থক্যগুলিও। যাইহোক বাংলা তথা ভারতীয় রাজনীতিতে ষাটের দশক সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই এগিয়ে গিয়ে রেখে গেছে পদসঞ্চার। যা বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমাদের মনে হয়।

৭০-এর ভারতের ইতিহাস— বিড়ম্বনার ইতিহাস; পাক ভারত যুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থানে ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও শেষমেশ কিন্তু সত্তরের গণতন্ত্রের ইতিহাস নিরাশার। সত্তর দশক শুরু হয়েছিল রাষ্ট্রপতি শাসনের মধ্য দিয়ে। এই দশকেই কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধী সরকারের পতন ঘটিয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে জনতা সরকারের প্রতিষ্ঠা। চালু হয়েছিল মিসা আইন, জারি হয়েছিল জরুরী অবস্থা। তবে

সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল নকশালবাড়ি আন্দোলন। যদিও এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ১৯৬৭ সালেই ১৫ মে। সেসময় উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে জোতদারদের সঙ্গে স্থানীয় ভূমিহীন কৃষকদের সংঘাত বাঁধে। এই সংঘাতকে কেন্দ্র করেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল যা পরে গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। জোতদারদের কবল থেকে উদ্ধার করা জমিতে ভূমিহীন কৃষকেরা যেমন একদিকে ফসল ফলিয়ে ঘরে তুলেছিলেন, তেমনই তাদের করতে হয়েছিল দীর্ঘ লড়াই ও সংগ্রাম। এসবের পাশে সমান্তরালভাবে বয়ে গেছে আশা-নিরাশার স্রোত, লড়াই-প্রতিলড়াইয়ের স্রোত। কোথাও বা 'তোমার নাম, আমার নাম ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম' কিংবা 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘের, মুক্তাঞ্চল গড়ে তোল' —এসব আদর্শকে সামনে রেখে স্পন্দিত বুকে সত্তর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার স্বপ্ন। কিন্তু এই স্বপ্ন নিয়েও চলেছিল ভুল বোঝাবুঝি ও শাসকশ্রেণির ষড়যন্ত্র। যার ফলশ্রুতিতে বাংলায় দেখা গিয়েছিল নারকীয় গণহত্যালীলা। এরপর নকশাল আন্দোলনের প্রধান নেতাদের (চারু মজুমদার, সরোজ দত্ত, সুশীতল রায়চৌধুরী) মৃত্যুতে এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। তবে একথাও সত্য যে নকশাল আন্দোলন ব্যর্থ হলেও এঁরাই কিন্তু ভূমিহীন কৃষকদের সংগঠিত করে মৌলিক ভূমি সংস্কারের প্রশ্নটিকে দেশের অর্থনীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। ষাট ও সত্তরের অভিঘাত নিয়ে বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক বিনয় ঘোষ তাঁর 'মেট্রোপলিটন মন' নামক প্রবন্ধে বলেছিলেন—

> 'অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শাসকরা তাঁদের কাজকর্মে সামান্য শালীনতাটুকুও বজায় রাখতে পারেন না। যত রকমের নোংরামি, অসাধুতা ও অন্যায় কাজ সরকারি ও বাণিজ্যিক জীবনকে বিষয়ে তুলেছে। জীবন থেকে ন্যায়বোধ, নীতিবোধ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। নগরকর্তাদের নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বলে কিছু নেই। দল হোক, ব্যক্তি হোক, সকলেরই কাম্য ও লক্ষ্য হল 'ওলটপালট

করে দাও, লুটেপুটে খাই'। যাঁরা উৎপাদন করেন আর যাঁরা ভোগ করেন, সমাজের এই দুই প্রধান শ্রেণির মধ্যে দূরত্ব ক্রমেই বাড়ছে।'

অর্থাৎ ষাটের দশক ছিল রাজ পথে উত্তাল ছাত্র-যুবক, কলকারখানা ও মাঠের বীর সেনানীদের রক্ত ঝরানো গণ আন্দোলনের সংগ্রামী জীবনের উজ্জ্বল দশক। এই দশকে যে রক্তবৃক্ষের বীজ রোপিত হয়েছিল সেটাই সত্তর দশকে ফুলে ফুলে ভরে উঠেছিল।

লক্ষ করলে দেখা যাবে সবচেয়ে বেশি সাহিত্য আন্দোলন হয়েছে এই ১৯৬০-১৯৮০-র সময়ে। যেমন হাংরি আন্দোলন, শ্রুতি আন্দোলন, নিম আন্দোলন, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন প্রভৃতি। আসলে স্বাধীনতার পরবর্তী সময় বৈশিষ্ট্যকে গায়ে মেখে বাংলা ছোটগল্প পাঠক-বিনোদনের যে ব্যবস্থা করেছিল, সেখানে প্রবল ধাক্কা মেরেছে ছয়ের দশকের শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন। প্রচলিত গতানুগতিক বাংলা সাহিত্যকে সমূলে উপড়ে ফেলে শাস্ত্রবিরোধীরা বদলে দিতে চেয়েছিলেন বাংলা ছোটগল্পের তথাকথিত ধারাকে। সাহিত্যের 'বিষয়' ও 'আঙ্গিক' সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণা নস্যাৎ করে তাঁরা শাস্ত্রবিরোধী গল্পে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন নতুন বোধ। আমরা যে সমস্ত গল্প পাঠে অভ্যস্ত সেই গল্পগুলিতে বিষয় হিসেবে উঠে এসেছিল—

ক. শহরের জীবন ও গ্রামের জীবন; শহরের জীবনে যান্ত্রিকতা, গ্রামজীবনে অশেষ শান্তি।

খ. মানুষের মন রহস্যময়, বাইরের চেহারা দেখে ভেতরের মানুষটিকে চেনা যায় না।

গ. অসাধারণ কোনো (Uncommon) চরিত্র।

ঘ. বাস্তব সমস্যা : সমাজ কোন পথে ইত্যাদি।

ঙ. আঞ্চলিক : বিশেষ অঞ্চলের মুখের ভাষা, সামাজিক প্রথা, খাদ্য-অখাদ্য প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য।

চ. বুদ্ধিমান নায়কের প্রেমে হতাশা বা চাকরিতে ব্যর্থতা ও তার জন্য দুঃখ।

এসমস্ত বৈশিষ্ট্যযুক্ত গল্পে লেখক ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জানেন। লেখক এখানে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। শাস্ত্রবিরোধীরা অদ্ভুত ঘটনার জাল বিস্তার করে বা অন্যান্য উপায়ে পাঠককে চমকে দেবার প্রবণতা মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের মতে, পরিবার বিশেষের উত্থান-পতন, কোনো অঞ্চলের মানুষ সমূহের ইতিহাস বর্ণনা সাহিত্যের বিষয় নয় এবং গল্প জীবনের ধারা-বিবরণী প্রচারে রত হতে পারে না। তাঁদের মতে গল্পের উদ্দেশ্য কোনো কাহিনি বলা নয়, অদ্ভুত চরিত্র উপস্থিত করা নয়, বিশেষ মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা বা সামাজিক সমস্যার আলোচনা নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে রমানাথ রায়ের একটি উদ্ধৃতি—

> ‘আমার প্রথম এবং প্রধান আপত্তি প্লট বা কাহিনি নির্মাণের বিরুদ্ধে। ...কিন্তু কি এই কাহিনি? এককথায় কাহিনি হচ্ছে কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত এমন সব নাটকীয় ঘটনা সমষ্টি যার আরম্ভ বিকাশ ও নির্দিষ্ট পরিণতি আছে। এবং সমালোচকেরা বলে থাকেন, এ সব নির্মাণের ওপরেই নাকি লেখকের প্রতিভার বিচার হয়। যদি তাই হয় তা হলে কি তা জীবনের প্রতি অবজ্ঞাকেই প্রশ্রয় দেয় না। কেননা, জীবন কাহিনির মতো কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত ঘটনা সমষ্টি নয়। জীবন কি অনেক বেশি এক ঘেয়ে, এলোমেলো এবং যুক্তি বিরোধী নয়? আমাদের প্রতিটি দিন কি আগের দিনের পুনরাবৃত্তি নয়? এমনকি আমাদের পুনরাবৃত্তিগুলো ঘড়ির কাঁটায় পর্যন্ত বাঁধা হয়ে আছে। বিয়ে করা বা মাথা ধরা ছাড়া কি ঘটে জীবনে? তা হলে সাহিত্যে কেন জীবনের নামে তথাকথিত বাস্তবতার নামে এক ভয়াবহ রক্তশূন্য কৃত্রিমতাকে প্রশ্রয় দেওয়া?’

অর্থাৎ শাস্ত্রবিরোধীদের মতে, সাহিত্য হওয়া উচিৎ জীবনের মতোই স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। সেখানে কোনো কৃত্রিমতাকে বা কোনো নিয়মকে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত।

এমনকি পাঠককে নাবালক ভেবে অবাস্তব কাহিনি রচনা করাকে তাঁরা শিল্পের ক্ষেত্রে মারাত্মক অপরাধবোধ বলে মনে করেন। ছয়ের দশকের শেষের দিকে কলকাতায় সার্কাস স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত বইমেলায় তাঁরা তাঁদের স্টলের মাঝখানে গতানুগতিক সাহিত্যের সমাধি নির্মাণ করেছিলেন। 'খোলা চোখ এবং শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে রমানাথ রায় বলেন—

> 'গতকাল পর্যন্ত আমরা ছিলাম অন্ধ। ...কোনো না কোনো তত্ত্ব বা দর্শনের ঠুলি পরে আমরা দেখি, আমরা শুনি, আমরা ভাবি, কিছু করি। এরই নাম দেওয়া হয়েছে সভ্যতা, যেখানে আমিত্বের পূর্ণ বিলোপ ঘটেছে। এই যদি সভ্যতা হয় আমরা তার ধ্বংস কামনা করি। আমরা এবার খোলা চোখে পৃথিবীকে দেখব। শুরু হবে একেবারে প্রথম থেকে।'

এর থেকে স্পষ্ট শাস্ত্রবিরোধীরা শিল্পের রাজ্য থেকে পূর্বের সমস্ত তত্ত্ব ও দর্শনের উৎখাত চেয়েছিলেন। বর্জন করতে চেয়েছিলেন শিল্প ও সাহিত্যের শাস্ত্রসম্মত পথকে। বর্জন করতে চেয়েছিলেন গল্প ও উপন্যাস থেকে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক বা আঞ্চলিক সমস্যা, মনস্তত্ত্ব, প্রেম অপ্রেম, ভাবুকতা এবং বুদ্ধিমত্তাকে।

শাস্ত্রবিরোধী ছোটগল্পের পত্রিকা 'এই দশক'-এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৬ সালের মার্চে। মোট চব্বিশটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। শেষের দিকে প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। শেষ সংখ্যাটিতে কোনো সন, তারিখ ছিল না। সম্ভবত এটি বেরিয়েছিল ১৯৮১ সালে। তবে আন্দোলন পূর্ণ গতিতে চলার বয়স ধরলে এটি সম্ভবত দশ-বারো বছর চলেছিল। 'এই দশক'-এর প্রথম সংখ্যার লেখক সূচিতে যে পাঁচজন গল্পলেখক ছিলেন তাঁরা হলেন—রমানাথ রায়, সুব্রত সেনগুপ্ত, শেখর বসু, আশিষ ঘোষ ও কল্যাণ সেন। কিছু সময় পরে আরও তিনজন গল্পলেখক এই আন্দোলনে যোগ দেন। যেমন—অমল চন্দ, বলরাম বসাক ও সুনীল জানা। পাশাপাশি বেশকিছু লেখক এমনও ছিলেন

যারা এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু মানসিক দিক থেকে যুক্ত ছিলেন—সেই সমস্ত লেখকদের লেখাও 'এই দশক' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। পত্রিকাটির আয়তন ছিল আড়াই, তিন বা চার ফর্মার মধ্যে। প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সাহিত্যের নতুন ধারা সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর, বইয়ের আলোচনা প্রভৃতিও থাকতো এই পত্রিকায়। স্বাধীনতার দু'দশক পরেও যখন স্বস্তিতে থাকার পরিবর্তে সমাজ-রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি স্তরে ক্ষোভ বাড়ছিল সচেতন মানুষের, সেসময় পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল, সেই অদ্ভুত পরিস্থিতি থেকে সকলেই বেরোতে চাইছিল। পরপর সরকার ভাঙাগড়া হচ্ছিল। মানুষের বিশ্বাস ভেঙে পড়তে শুরু করেছিল ষাটের মাঝামাঝি থেকেই। এসবেরই একটা ছায়া পড়েছিল সাহিত্যে। আমরা জানি হাংরি জেনারেশন সেসময়ের সবকিছুকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করলো, আর শাস্ত্রবিরোধীরা প্রথাগত সাহিত্য-শাস্ত্রের বিরোধিতায় নামলো। তবে অনেকেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে অন্যরকমভাবে প্রকাশিত হতে চেয়েছিলেন। শাস্ত্রবিরোধীদের আবার অনেকেই চরমভাবে আক্রমণ করেছিলেন কিন্তু শাস্ত্রবিরোধীরা গল্প বলার রীতিটাকেই আক্রমণ করলেন, ভাঙতে চাইলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে 'ছোটগল্প', 'নতুনরীতি' বিমল করের হাত ধরে এর আগেই গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে বিমল কর 'দেশ' পত্রিকায় বার বার রমানাথ রায়, সুব্রত সেনগুপ্ত, কিংবা শেখর বসুদের গল্প ছেপেছেন। অর্থাৎ তিনি শাস্ত্রবিরোধীদের প্রশ্রয় দিতেন। শাস্ত্রবিরোধীরা ইস্তাহার প্রকাশ করে বলেছিলেন—গল্প থেকে কাহিনি বর্জন করবেন। কিন্তু পরে দেখা গেছে যে তাঁদের অনেকের গল্পেই কাহিনি এসেছে। তবে তাঁরা গল্প বলার একটা নতুন ভঙ্গি তৈরি করে দিয়েছিলেন। সফলভাবে রমানাথ রায় যে ভঙ্গিতে সব সময় গল্প লিখেছিলেন, তাঁর লেখার ওই বিশেষ ধরন তাঁকে বিশেষত্ব দিয়েছে। সেই সঙ্গে শেখর বসুর 'চারজন যুবতী মা', 'টাঙ্গি'; আশিষ ঘোষের 'ঝাড় লণ্ঠনের তেকোনা কাঁচ'; কল্যাণ সেনের 'পরিত্যক্ত পান্থশালা ও তারা চারজন'; কিংবা অমল চন্দের 'বারান্দা', 'সাঁকো' —ইত্যাদি শাস্ত্রবিরোধী ধাঁচে লেখা গল্পগুলি সমাজ ও জীবন সম্পৃক্ত বলে সবার মনে আছে, মনে থাকবেও। তাঁদের গল্পে হঠাৎ করে গল্প হারিয়ে যেত— খুব ছোট ছোট

বাক্য-প্যারাগ্রাফ-ক্রিয়াপদ ছাড়াই সম্পূর্ণ বাক্য, আবার কারও কারও গল্পে বুননটাই আসল হয়ে উঠলো। বিশেষ করে সুব্রত সেনগুপ্ত, অমল চন্দ, আশিষ ঘোষ, বলরাম বসাক, শেখর বসু, সুনীল জানা এবং অবশ্যই রমানাথ রায়—ছয়ের দশকে নতুনভাবে গল্প বলার সাহস দেখিয়েছিলেন বলেই সত্তরের লেখকদের গল্পে একটা পরিবর্তন আসতে পেরেছিল। শাস্ত্রবিরোধী গল্পগুলি সামনে না থাকলে পরবর্তী সময়ের গল্পগুলি ঘটনাকেন্দ্রিক হয়েও একটু অন্যরকম হয়ে উঠতে পারতো না বোধ হয়। ৭০-এর সময় থেকে বাংলা গল্পে যে এক ধরনের ডকুমেন্টেশন ঢুকল, হিপোক্রাট ঢুকল— এই যে এক্সপেরিমেন্টগুলো লেখকরা করেছিলেন, তার পেছনে শাস্ত্রবিরোধীদের অবদানের কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। যেমন একটি সাক্ষাৎকারে কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র বলেছিলেন—

> ‘শাস্ত্রবিরোধী গল্পগুলি পড়ে বুঝেছিলাম, একটু অন্যরকম ভাবে লেখা যেতেই পারে। যেমন আমার ‘দানপত্র’ গল্পটি পুরোটা দলিলের ফরম্যাটে লেখা। গল্পের বিষয়ে নয়, আঙ্গিকে অবশ্যই হাংরি-শাস্ত্রবিরোধীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলাম। আমাদের কালে গল্পের ফর্ম সম্পর্কে যে সচেতনতা তৈরি হয়েছে সেটা শাস্ত্রবিরোধীদের প্রভাব তো বটেই। ...শাস্ত্রবিরোধীদের প্রতিফলন কিনা জানি না, স্বপ্নময়-নলিনীরাও তো গল্পে গল্পে সফলভাবে নিজেদের ভেঙে চলেছেন।’

শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন এক দশক বা তার একটু বেশি সময় ধরে চলেছিল। সময়ের নিয়মে আন্দোলন থেমে গেছে ঠিকই তবে একথা স্বীকার করতেই হবে পাঠকের ঔদাসীন্য, গতানুগতিক গোল গল্পের রমরমা, প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা-সম্পাদকের উন্নাসিকতা এবং তাঁদের অল্পবিস্তর চোখরাঙানিতে সেসময় শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলনের সত্য মূল্যায়ন হয়নি। কিন্তু পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে এসেও বুঝতে অসুবিধা হয় না ষাট-সত্তরের বাংলা সাহিত্য শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের জোরদার ধাক্কায় এক নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

করেছিল। পরবর্তী সময়ে সাহিত্য যখনই ব্যাপক পরিবর্তনের সামনে দাঁড়াবে সেই অভিজ্ঞতাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারবে না।

ষাটের দশকে বাংলা সাহিত্যে আর একটি অন্যতম আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল যা হাংরি আন্দোলন নামে খ্যাত। এই আন্দোলনকারীরা সাহিত্যকে পণ্য ভাবতে পারেননি কোনোভাবেই। তারা এক পৃষ্ঠার লিফলেট প্রকাশ করে আগ্রহীদের বিতরণ করতেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। হাংরি জেনারেশনের পূর্বে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার কথা কোনো সাহিত্যিক স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। হাংরি জেনারেশন তাঁদের পত্রিকার নামকরণ করতেন—জিরাফ, জেব্রা, উন্মার্গ, ধৃতরাষ্ট্র, প্রতিদ্বন্দ্বী যা মানুষের মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। কারণ এর পূর্বে পত্রিকাগুলির নাম রাখা হতো কৃত্তিবাস, কবিতা, উত্তরসূরি, পূর্বাশা, শতভিষা প্রভৃতি। হাংরি আন্দোলনের পাশাপাশি আমরা দেখেছি নিম সাহিত্য আন্দোলন ও শ্রুতি আন্দোলন। এই সমস্ত আন্দোলন নিয়েই যদিও প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। হাংরিরা নিজেদের মতো করে লেখার চেষ্টা করেছিলেন তবে তাঁদের লেখার মধ্যে আরোপিত সত্ত্বার একটা ব্যাপার ছিল। যেখানে ভারতীয়তার খোঁজ খুব বেশি হয়নি। মোটামুটি ভাবে বলা যায়, ইউরোপের থেকে ধার করা চিন্তা নিয়েই তাঁরা কাজ করতে আরম্ভ করেছিলেন, যা তাঁদের লেখালেখি পড়লেই বোঝা যায়। সমীর রায়চৌধুরী ছিলেন হাংরি আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে একজন অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ। পাশাপাশি অরুণেশ ঘোষ, মলয় রায়চৌধুরী, দেবী রায়, সুবিমল বসাক সহ আরও অনেকেই হাংরি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে এই আন্দোলনের যে কথামুখ সেটা অরুণেশ ঘোষ ঠিক করলেন, না মলয় রায়চৌধুরী ঠিক করলেন, নাকি শৈলেশ্বর ঘোষ ঠিক করলেন— সে নিয়ে প্রচুর বাকবিতণ্ডা রয়েছে। বেশকিছু বই বেরিয়েছে, ডকুমেন্ট বেরিয়েছে যাতে দেখা যাচ্ছে যে মলয় রায় চৌধুরী বলেছেন, শৈলেশ্বর ঘোষ নাকি পুলিশের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, আবার শৈলেশ্বর ঘোষ পুরোপুরি উল্টো কথা বলেছেন মলয় রায়চৌধুরীকে নিয়ে। মলয় রায়চৌধুরী নাকি সেরকম কিছুই

করেননি, চাকরি করতেন এবং হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগ তাঁর ছিল না। মলয় রায়চৌধুরী বলেছেন যে তিনি নাকি জেলে ছিলেন। ফলে এ সমস্ত কথা, কাঁদা ছোড়াছুড়ি অর্থাৎ পরস্পর দোষারোপ ও পরস্পরকে সন্দেহ প্রকাশ লক্ষ করা গেছে যা নকশাল আন্দোলন ভেঙে যাওয়ার পরও আমরা ব্যাপকভাবে লক্ষ করেছি। যদিও নিম সাহিত্য আন্দোলন যা বিমান চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র গুহ প্রমুখরা মিলে করেছিলেন, এটা নিয়েও বিপুল তর্ক-বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে যুব আন্দোলন সংগঠিত হতে দেখা গিয়েছিল তা হল হিপি (হিপ্পি) আন্দোলন। যা পরবর্তীতে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। হিপিরা নানা ধরনের নেশা করে, উদ্দাম যৌন জীবন যাপন করে। হিপি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মানুষেরা সাইকেডেলিক গান শুনতেন এবং যৌনতা বিপ্লব গ্রহণ, ড্রাগ ব্যবহার প্রভৃতি করতেন। হিপিয়া যখন ভারতে এসেছিল তখন 'কৃত্তিবাসী' কবিরা তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে নেপালে চলে গিয়েছিলেন ঘুরতে। এমনকি কলকাতার বেশ্যাবাড়ি, শ্মশান, গাঁজার আড্ডাসহ যেকোনো জায়গায় হিপিরা চলে যেতেন। এই হিপি সংস্কৃতির প্রভাব কলকাতার লেখকদের মধ্যে পড়েছিল বলে অনেকেই মনে করেন। সেসময়ই কিন্তু হাংরি জেনারেশনকে আমরা লক্ষ করেছি। হিপিরা কাশীতে থেকেছেন মাসের পর মাস। নেপালেও থেকেছেন বজরা ভাড়া করে। কাঠমান্ডু এক সময় হিপিতে ভর্তি ছিল। এই হিপিদের থেকেও ব্রিটিশদের প্রভাব বেশি পড়েছিল হাংরিদের লেখায়। ব্রিটিশরা পিয়ানো বাজানোকে অস্বীকার করেছিল। কোট-টাই পরা ছেড়ে দিয়েছিল, কখনো খালি গায়ে, খালি পায়ে গিটার বাজিয়ে নিজেরা নিজেদের মতো করে গাইতে শুরু করেছিল। হিপি কিন্তু কোনো মুভমেন্ট নয়, এটা একটা প্রোটেস্ট, ব্রিটিশরা যা করেছিল সেটাকে বলা যেতে পারে একটা মুভমেন্ট।

আবার কলকাতা ময়দানে তখন 'মুক্তমেলা' হচ্ছে। শিবনারায়ণ রায়, গৌরকিশোর ঘোষ, অসিত পাল প্রমুখরা 'মুক্তমেলার' সমর্থক ছিলেন। তবে নকশালরা সেখানে বোমা ফেলার চেষ্টা করেছিল। কারণ গৌরকিশোর ঘোষ প্রমুখরা ছিলেন কার্যত কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী।

যেকোনো সাহিত্য বা শিল্পের আন্দোলন তার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে যেমন জড়িয়ে থাকে তেমনই রাজনৈতিক অভিঘাত, রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিকতা, সামাজিক দোলাচল, অর্থনৈতিক টানাপোড়ন, রাজনীতির বিস্ফোরণ অথবা বিস্ফোরতাকে একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। যে লেখক সময়ের ঊর্ধ্বে উঠে সময়ের তরঙ্গকে, কাল তরঙ্গকে পার করে আরও বড় সময়ের দিকে যেতে চান, তাঁর লেখায় এই সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিঘাত সম্পূর্ণতা উপস্থিত থাকে। তবে প্রত্যক্ষতা উপস্থিত না থাকলেও পরোক্ষতা থাকে যেমন— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় প্রত্যক্ষ রাজনীতি নেই কিন্তু পরোক্ষ রাজনীতি রয়েছে। তাঁর বেশ কিছু গল্পে দুর্ভিক্ষের বিপুল বিবরণ এবং রাজনৈতিক অভিঘাত কিন্তু স্পষ্টতর। মানিক, তারাশঙ্কর ও সতীনাথ ভাদুড়ীও কিন্তু রাজনীতির লেখাই লিখেছেন নিজেদের মতো করে। তাঁরা এতো বড় শিল্পী যে তাঁদের লেখা সময়ের দলিল হয়ে থেকে গেছে। ১৯৬০-৮০ এই যে কুড়ি বছরের বৃত্ত বা পরিমাপ তা পৃথিবীর যে বিপুল আয়ু ও কালখণ্ড তার তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু তবুও বিশাল মহীরুহের নিচে ছায়ায় যেভাবে বৃক্ষ, তৃণ, ঘাস বেড়ে ওঠে, তেমনি এই মহাসময়ের কোলের মধ্যে এই কুড়ি বছরের লেখালিখি ও লিখনের যে আয়োজন তা পরিস্ফুট হয় বারে বারে। সাহিত্যের আন্দোলন আমাদের জীবনে বারে বারেই ছায়া, আলো, অগ্নুৎপাত ও অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা, প্রেম, আহ্লাদ, জীবন যাপন, যৌনতা অর্থাৎ মানুষের স্বাভাবিক যে বোধগুলি, সেই বোধগুলিকে প্রস্ফুটিত করার জন্যই সাহিত্যের কিছু কাজ বা যাত্রা রয়েছে। এই যে প্রবৃত্তি বা বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন স্বদেশ প্রেম, বিদ্রোহ, বিপ্লব, রাজনৈতিক বোধ, নারীর প্রতি আকর্ষণ, শিশুর প্রতি ভালোবাসা, পরিবারকে দেখা—সবটা

মিলিয়ে যে জীবন তরঙ্গ তা ষাট ও সত্তরের লেখকদের লেখায়ও এসেছে। আবার এই সবটা মিলিয়ে যে সাহিত্যের পরিসর সেখানে কেউ রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষে কথা বলছেন, কেউ রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে কথা বলছেন, কেউ কেউ বলছেন যে প্রেম, যৌনাকাঙ্ক্ষা, লিবিডো— এগুলোই হচ্ছে বড় ব্যাপার। কারও মতে, বিদ্রোহ, বিপ্লব, সশস্ত্র সংগ্রামই হল মূল বিষয় কিন্তু সেখানে ঘটনাক্রমে প্রেম আসতেই পারে তাতে সমস্যা নেই। ফলে এই যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, পারস্পরিক টানাপোড়ন সেটাই সাহিত্যের জলছবি বা ব্যর্থ ছবি বা সফল ছবি হিসেবে আমাদের সামনে আসে এবং সাহিত্য তার মতো করে এগোয়। ষাট ও সত্তরের দশকও এর ব্যতিক্রম নয়। তেমনই সাহিত্যের ছোট ছোট যে ভূখণ্ড বা ভূমিকা তার মধ্য থেকেও কিন্তু এক উজ্জ্বল দ্বীপ উঠে আসে—যে উজ্জ্বল দ্বীপের মায়া মরীচিকা ভেদ করে পাঠক তার সময়কে ও সময়ান্তরকে জানতে চান, জানতে পারেন।

এখন প্রশ্ন হল এই কুড়ি বছরে (১৯৬০-৮০) কি লেখালেখি হয়েছে? আমাদের বাঙালি লেখকরা কি লিখছেন? সমালোচকেরা বলে থাকেন নকশালবাড়ির আন্দোলন নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র মহাশ্বেতা দেবী ছাড়া আর কেউ এই আন্দোলনের গভীরে প্রবেশ করে লিখতে পারেননি। এদিক থেকে মহাশ্বেতা অনন্য, অপরাজেয়। অনেকেই নকশাল আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করেছেন আবার অনেকে না বুঝে অন্য একটা দিক দেখাতে চেয়েছেন। উদ্বাস্তু আন্দোলন নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'অর্জুন' পলাতক যদিও এটি সিনেমা হয়েছিল কিন্তু তার সঙ্গে সেই অর্থে উদ্বাস্তু আন্দোলন বা কলোনি জীবনের কোনো যোগসূত্র নেই বললেই চলে। নকশাল আন্দোলন নিয়েও পরবর্তী সময়ে সুনীল লিখেছেন তবে তার মধ্যে রোমান্টিক বাস্তবতা বেশি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল অল্প পরিচিত লেখকরাই সেসময়ের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে কলম ধরেছিলেন। যেমন ব্রজেন মজুমদার ১৯৬৬ সালে 'একটি লেখকের গল্প' প্রকাশ করেন, গল্পে দেখা গেছে ১৯৬২ সালের

ভারত-চিন সীমান্ত সংঘর্ষের আবহ। এমনকি 'জয় ইঞ্জিনিয়ারিং' কলকারখানায় ধর্মঘটকারী শ্রমিকদের ওপর পুলিশ ও গুণ্ডা বাহিনীর নির্যাতনের কথা ও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী সমর্থকদের জনবিচ্ছিন্ন করার জন্য শাসকশ্রেণির তীব্র অত্যাচার ও পীড়নের বাস্তব প্রেক্ষাপট। শংকর বসু লিখেছেন 'কপিলের মুলুকযাত্রা'। যা ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ভেঙে যাওয়া অর্থাৎ বিভাজনের ফলে পার্টির একনিষ্ঠ এক কর্মচারীকে কীভাবে হতাশার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তারই বিষাদ-প্রলপিত আখ্যান নিয়ে এই গল্প। ব্রজেন মজুমদারের 'জননী' গল্পটি জোতদার ও জমিদারের হামলায় বিধ্বস্ত কৃষক সমিতির সংগঠন পুনর্গঠনের উদ্যোগ পর্ব নিয়ে রচিত। ব্রজেন মজুমদার তাঁর 'পথ' গল্পে দেখিয়েছেন ১৯৬৫-৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সংকটের ফলে উদ্ভূত সাধারণ খেটে খাওয়া পরিবারের চরম দুর্দশার চিত্র। জ্যোৎস্নাময় ঘোষ লিখেছিলেন 'বাঘবন্দি' নামে একটি গল্প। যেখানে একজন সক্রিয় খাদ্য আন্দোলনকারীর মধ্য দিয়ে সেই সময়ের অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের বহু খুঁটিনাটি তুলে ধরেছেন। ব্রজেন মজুমদারের 'খোদহাটির ডাক' নামক গল্পে ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরবর্তী সময়কালের আবহকে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি গল্পটি শারদীয় 'আবাদ' পত্রিকায় ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। শৈবাল মিত্র লিখেছিলেন 'সংগ্রামপুর যাত্রা' নামক গল্পটি। যা ১৯৬৮-৬৯ সালে ঘটে যাওয়া শ্রেণি সংগ্রাম বা কৃষক সংগ্রামকে লক্ষ করে রচিত। অজিত মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'একশো ষাট জন' নামক গল্পটি। যার প্রেক্ষাপট পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬৯-৭১-এর রাজনৈতিক অবস্থা। কমল চক্রবর্তী লিখেছিলেন 'প্রথম শনিবার' গল্পটি। যা রচিত হয় ১৯৬৯ সালের জামশেদপুরের আবহ নিয়ে। স্বর্ণ মিত্র রচনা করলেন 'আটটা-নটার সূর্য'। ১৯৬৮ সালে চারু মজুমদার শ্রেণি সংগ্রামের পথ অবলম্বনকারীদের যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন অর্থাৎ তিনি নকশালপন্থী যুবকদের গ্রামে গিয়ে ছোট ছোট গেরিলা বাহিনী তৈরি করে তাদের মাধ্যমে জোতদার-মহাজন ও জমিদারদের হত্যা করার মাধ্যমে কৃষি বিপ্লবের রাজনৈতিক মতাদর্শকে গৌরবান্বিত করার যে চেষ্টা করেছিলেন—সেই প্রেক্ষাপটকে বিষয় হিসেবে বেছে নিয়ে রচনা করা হয়

‘আটটা-ন’টার সূর্য’ গল্পটি। স্বর্ণ মিত্র ‘রজনীগন্ধার দুটি সন্ধ্যা’ নামক গল্পটিতে মেদিনীপুর জেলার যে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি রয়েছে, সেই অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী মানুষদের মনে নকশালপন্থীদের চেতনা জাগ্রত করে ১৯৬৯ সালে যে লড়াই শুরু হয়েছিল তা বিবৃত করেছেন। ১৯৬৮ পরবর্তী বাংলা-উড়িষ্যা সীমান্তের অভিজ্ঞতা নিয়ে স্বর্ণ মিত্র লিখেছিলেন ‘বাঘ শিকার’ গল্প। যেখানে আদিবাসী অধ্যুষিত জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা প্রাক্-সামন্ততান্ত্রিক যুগের শোষণ ও বঞ্চনার সত্য রূপটিকে গল্পকার পরিস্ফুট করেছেন। জয়ন্ত জোয়ারদার লিখলেন ‘খতমের খতিয়ান’ যা বেলাড়ি গ্রাম অর্থাৎ যে গ্রাম উত্তর বিহারের কোশী ক্যানেলের পাশে অবস্থিত, এই বেলাড়ি গ্রামের বন্ধুয়া মজুরদের উপর জমিদারদের শোষণের নগ্নরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে এই গল্পে। অসীম রায় লিখলেন ‘অনি’ —যা সমালোচকদের কাছে খুবই প্রশংসনীয় একটি গল্প। ১৯৬৭-১৯৭১-এই যে সময়কালে যেভাবে নকশালদের আবির্ভাব, সশস্ত্র সংগ্রামে তাদের এগিয়ে যাওয়া, তাদের ভাবাদর্শ এবং ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুবকদের আন্দোলনে যোগদান ও পরিণতিতে রাষ্ট্রের হনন প্রবৃত্তি এই পুরো ব্যাপারটা নিয়েই ‘অনি’ রচিত হয়েছে। আসলে অসীম রায় নিজের সময়কালকে যেভাবে লেখায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা আর কোনো গল্পকারের রচনায় সেভাবে দেখা যায় না। ‘আরম্ভের রাত’ থেকে ‘ট্যাক্সি ড্রাইভার’—আঠারো বছরে মাত্র চৌষট্টিটি গল্প তাঁর। তবে তাঁর গল্প বাণিজ্যিক প্রকাশ ভবনগুলির আনুকূল্য পায়নি কখনোই। ‘দেশ’ পত্রিকায় গল্প ছাপা হওয়া সত্ত্বেও সম্ভবত বৃহত্তর পাঠক গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছোতে পারেননি তিনি। স্বর্ণ মিত্র রচিত আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল ‘প্রসব’ —যা ১৯৬৯-৭০ সালে ঘটিত ‘কৃষি বিপ্লব’-এর ডাকে যারা গ্রামে গিয়েছিলেন, সেই নকশালপন্থীদের সঙ্গে পুলিশ, সি.আর.পি-র সংঘর্ষ ও উদ্দীপনাকে কেন্দ্র করে রচিত। স্বর্ণ মিত্র ‘নকশাল আন্দোলনের যে তাপ, উত্তাপ, টালমাটাল রাজনৈতিক অবস্থা— এই অবস্থা নিয়ে আরো একটি গল্প লিখেছিলেন, যা হল ‘ভিখিরির উপদ্রব’। গল্পকার মিহির সেন লিখেছিলেন ‘আলোয় শুধু’। যার প্রেক্ষাপট ছিল সত্তর দশকের সূচনাকালের শহরতলী। ব্রজেন মজুমদারের আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল

‘মুখোমুখি ওরা’ —যা ১৯৮১ সালে প্রকাশিত। কিন্তু গল্পের প্রেক্ষাপট ১৯৭০ সালের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ। ১৯৬৭ সালের পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের যে রাজনৈতিক অভিঘাত ছিল, সেই অভিঘাতে যারা প্রকাশ্যে অংশগ্রহণ করতে পারেননি বা যাদের ভূমিকা ছিল নগণ্য সেই সমস্ত মানুষরাও কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিঘাত এড়াতে পারেননি। এই বিষয়টিই নির্মাল্য বর্মণের ‘দরজায় দাঁড়িয়ে অম্বুজ’ গল্পে সার্থক শিল্প সুষমায় রূপায়িত হয়েছে। মনোজ দাস লিখেছেন ‘ওথেলো’, যা ১৯৭১ সালের সশস্ত্র নকশাল আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ অবস্থা নিয়ে বর্ণিত হয়েছে। সাধন চট্টোপাধ্যায় ‘মুক্তিপণ’ নামে একটি গল্প লিখেছিলেন যেখানে নকশাল আন্দোলন দমানোর জন্য নিয়োজিত পুলিশদের নিষ্ঠুর চরিত্র চিত্রায়িত হয়েছে। প্রদীপ মিত্র লিখেছেন ‘সময় অসময়’ গল্পটি। যে গল্পে নিরুপমা নাম্নী একজন মহিলার অসহায় বিমর্ষ কালযাপনের ছবি গল্পকার চিত্রায়িত করেছেন। নিরুপমার স্বামী ১৯৭১ সালের দ্বিতীয়ার্ধে একজন উচ্চপদস্থ গোয়েন্দা অফিসার ছিলেন। যার নাম মৃগাঙ্ক। গল্পে নিরুপমার অসহায়তার পাশাপাশি স্থান পেয়েছে মৃগাঙ্কর নকশাল আন্দোলনকারীদের প্রতি নির্মম আক্রোশ এবং মদ্যাসক্তি। মিহির আচার্য লিখেছেন ‘মা’। এই গল্পে দেখা যায় ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী দুই অভিন্নহৃদয় সংবেদ্য বন্ধুর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও বন্ধুর মায়ের মনকে কীভাবে জয় করে নেয় একজন। জগন্নাথ প্রামাণিক লিখেছেন ‘স্বর্গের পাখিরা’, যা জয়া নামের একটি মেয়ের জীবনে প্রেম, বিশ্বাস কীভাবে তৎকালীন সময়-অভিঘাতে ভেঙেছে, গড়েছে তা দেখানো হয়েছে। মানবেন্দ্র পাল রচিত ‘অভিনয়’ সত্তর দশকের সূচনাকালের পশ্চিমবঙ্গের এক বুদ্ধিজীবী দম্পতির কার্যকলাপের বর্ণনা। স্বপন সেনের ‘সাদা রুমাল’ ১৯৭০-৭১ সালের পশ্চিমবঙ্গের উত্তপ্ত রাজনীতির প্রেক্ষাপটে রচিত। কৃষ্ণ চক্রবর্তীর ‘আসামি এবং তার বিচার’ গল্পে লক্ষ করা যায় রঞ্জন নামের একজন যুবককে, যে রাজনীতির সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত নয় অথচ পুলিশ সেই যুবকটিকে নকশাল সন্দেহে চরম অত্যাচার চালিয়ে যায়। জ্যোৎস্নাময় ঘোষের ‘পাড়ি’ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত। ১৯৭১ এর ২৬ মার্চের পরবর্তী দিনগুলোতে হাজার হাজার মানুষ নিজের বাসভূমি ছেড়ে

একটু আশ্রয়ের জন্য পাড়ি দিয়েছিল অনির্দেশ অভিমুখে—এই করুণ ছবিও গল্পে রয়েছে। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল রচনা করেছিলেন 'একটি নাটকের ভূমিকা'—যেখানে পুলিশের দ্বারা নকশালদের খুন কীভাবে নিমেষের মধ্যে জনজীবনকে অস্বাভাবিক ও আতঙ্কিত করে তোলে তার বিশ্বস্ত রূপ নির্মিত হয়েছে। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল 'শান্তিনীড়' নামে আরো একটি গল্প লিখেছিলেন যেখানে রয়েছে এমন একটি পরিবারের কথা যারা কখনোই কোনো রাজনীতি বা কোনোরকম অশান্তিতে নিজেদের জড়ায়নি। কিন্তু ১৯৬৯-৭০ সালে কলকাতার প্রতিদিনের গণ্ডগোল, বোমাবাজি, পুলিশের অত্যাচার, স্কুল-কলেজের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া পরিবারটিকে শান্তি দেয় না। অর্থাৎ গল্পকার দেখাতে চেয়েছেন যে রাষ্ট্রের অত্যাচারে রাজনীতি বিমুখ মধ্যবিত্তকেও 'বিপ্লবী রাজনীতি'-র প্রতি অনিবার্যভাবে আগ্রহী হতেই হয়। ১৯৭৮ সালে শচীন দাশ লিখেছেন 'লাইনের পাশে' গল্পটি। এই গল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে স্বাধীনতা-পরবর্তী জবরদখল কলোনির বাসিন্দাদের ট্র্যাজেডিময় জীবনের ছবি। জয়ন্ত জোয়ারদারের একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল 'জয় পরাজয়'—যার প্রেক্ষাপট ১৯৭১-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি। কারণ ওই দিনই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের সামনে রাত ন'টার সময় একজন ট্রাফিক কনস্টেবল খুন হয়েছিল। আবার চিত্ত ঘোষালের 'দারাসুত পরিবার' গল্পে ১৯৭০-৭১ সালের পশ্চিমবঙ্গের যে সন্ত্রাসতাড়িত টালমাটাল অবস্থা ছিল তার নিখুঁত ছবি পরিস্ফুট হয়েছে। এছাড়াও সুযশ ভট্টাচার্য লিখেছেন 'গাণ্ডীব'—যেখানে গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে এই নকশালদের কর্মসূচি পালন এবং কার্যক্রম অব্যাহত রাখার চিত্র বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও ধর্মদাস মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'দেওয়ালের লিখন', ব্রজেন মজুমদারের 'শেষ নহে', মিহির ভট্টাচার্যের 'বাল্মীকির মা', বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের 'বড় গাছ', 'জান খালাস', 'বিশেষ সাক্ষাৎকার', সিদ্ধার্থ ঘোষ 'বার্তা', 'রিপোর্টাজ', 'জনক', স্বর্ণ মিত্রের 'চাষির গল্প', মীনাক্ষী সেনের 'মাসিমা', অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়ের 'আজ কাল পরশুর গল্প', মিহির আচার্যের 'লোহার খুর', শৈলেন চৌধুরীর 'ছাপোষা', রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জলযাত্রা', প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য।

'এই দশকের গল্প' নামে ১৯৬০ সালে বিমল কর যে গল্প সংকলন প্রকাশিত করেছিলেন, সেখানে যে সমস্ত লেখকরা নিজেদের সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দিব্যেন্দু পালিত, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী, দেবেশ রায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রধান। এঁদের প্রত্যেকের লেখায় নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তৎকালীন বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করে ব্যক্তির অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের সংঘাত অর্থাৎ ব্যক্তির মূল্যবোধের বিপর্যয় নিয়ে রচনা করেছিলেন 'চারুলালের আত্মহত্যা', 'স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু', 'আত্মপ্রতিকৃতি', 'মৃণালকান্তির আত্মচরিত' প্রভৃতি গল্প। যে গল্পগুলিতে মানুষের যন্ত্রণাক্লিষ্ট হতাশাময় অন্তরপটকে উন্মোচনের জন্য, আবার কখনো বা এই যন্ত্রণাময় সত্তার প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই তিনি ভিন্ন মূল্য চেতনার সন্ধান করেন। পাশাপাশি মানুষের মূল্য চেতনার উত্তরণের পথ সন্ধান জানাতেই অতীন্দ্রিয় জগতের দ্বারস্থ হন। আসলে পারিপার্শ্বিক জীবনের গ্লানি, যন্ত্রণা এবং মূল্যবোধের বিপর্যয় তাঁর সংবেদনশীল হৃদয়ে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল মূল্যবোধহীনতার, সেই ক্ষতই তাঁকে প্ররোচিত করেছিল গল্প রচনায়। এই গল্পগুলি মানবিক সম্পর্কের গল্প নয়, জীবনের অর্থহীনতা, জীবনের মূল্যহীনতার গল্প। আধুনিক জীবনের অবসাদ, অর্থহীনতা, মূল্যবোধের ক্ষয় কীভাবে ব্যক্তি মানুষের গোচরে এবং অগোচরে ক্রিয়াশীল হয়ে জীবনকে অর্থহীন করে তোলে তা গল্পকার শীর্ষেন্দুর অনুভবে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ষাটের দশকে বাংলা সাহিত্য জগতে যে পালাবদল আমরা লক্ষ করি এর পেছনে রয়েছে সমকালের পরিবেশ। কারণ দেশ স্বাধীন হয়েছে ঠিকই তা কিন্তু মানুষের স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ হয়েছিল। স্বাধীনতার পর ১৯৪৭-৫৯ এই সময়কালে মানুষের মনে স্বাধীনতা সম্পর্কিত যে মোহ ছিল তা অনেকটাই মুছে গিয়েছিল। ষাটের দশকের শুরু থেকেই অবহেলিত কৃষি ও ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যার কারণে দেখা দিয়েছিল খাদ্য সমস্যা। যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক দুরবস্থা চরমে পৌঁছে ছিল। 'এই দশকের গল্প'-এর ভূমিকায় বিমল কর বলেছিলেন—

'নৈরাশ্য, বেদনা, জটিলতা, আত্ম বিদ্রূপ এযুগের লেখকদের হাতে যত অকৃত্রিমভাবে ফুটে উঠেছে সম্ভবত তেমন আর পূর্বে হয়নি। কিন্তু বর্তমান দশকের প্রান্তে এসে দেখা বাংলা ছোটগল্প নতুন করে আবার সজ্জা রচনা করেছে। ৩৯-শের যুদ্ধ ৪৫-শে পেশাদারী ভাবে থেমেছে, দাঙ্গা দেশভাগের পর শাসনতন্ত্র নিজেদের হাতে এসেছে আর তারপরও হাওড়া পুলিশের তলা দিয়ে একযুগ কতো না জাহ্নবী জল বয়ে গেল—এখন সে যুগের উত্তেজনা শান্ত, শ্লেষ বিস্মৃত, বেদনা অপসৃত। একদা আগুন লাগার কালে আমরা যতটা হতচেতন হয়েছিলাম এখন সে প্রলয় সময় কেটে গেলে অনেকটা সুস্থির হয়েছি, সেই ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে অতঃপর আশ্রয় কোথায়? এই ধ্বংসস্তূপের জঞ্জাল সরিয়ে কাজে লাগানোর মতন কিবা নেওয়া যায়। এই দশকের লেখকেরা সম্ভবত এই কথাটি ভাবছেন। তাঁদের চরিত্র বিচার করতে বসে আমার অন্তত সেরকমই মনে হয়েছে। যে জ্বালায় আমরা পুড়েছিলুম এঁরা সেই জ্বালার তাৎক্ষণিক ক্লেশ থেকে মুক্ত। সুতরাং পোড়া চেহারার রূপটি অনেকখানি নৈর্ব্যক্তিক চোখে দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের প্রাথমিক আপৎ থেকে মুক্ত বলে এঁরা আরও ব্যাপক জগতকে দেখায় ব্রতী।'

সুতরাং এর থেকে স্পষ্ট এই সমস্ত লেখকরা তাঁদের গল্পে স্বাভাবিকভাবেই জীবনের গভীর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, অস্থির যুগের কারণ অনুসন্ধান ও সতর্ক অকপট অন্তরঙ্গতাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তবে ষাট ও সত্তর দশকে ব্যক্তির মূল্যবোধের সংকট ও মূল্যবোধের বিপর্যয়ের প্রতিফলনে বাংলা ছোটগল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। যেখানে 'এই দশকের গল্প' গ্রন্থের মাধ্যমে যাঁরা সাহিত্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁদের পাশাপাশি মহাশ্বেতা দেবী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সমরেশ বসুর গল্পও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহাশ্বেতা দেবীর 'জগন্নাথের রথ', 'সাঁঝ সকালের মা', শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ছায়া পূর্বগামিনী', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'গোম্ন', 'আলো', মতি নন্দীর

‘শবাগার’, ‘একটি পিকনিকের অপমৃত্যু’, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিজনের রক্তমাংস’, ‘দশ বছর পর একদিন’, দিব্যেন্দু পালিতের ‘মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ’, ‘মানুষের মুখ’, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বজরা’, ‘কালবেলা’, দেবেশ রায়ের ‘হাড়কাটা’, ‘আহ্নিক গতি ও মাঝখানের দরজা’, ‘পা’, ‘কলকাতা ও গোপাল’, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অশ্বমেধের ঘোড়া’, ‘নরকের প্রহরী’, ‘ঘাম’, ‘অশোক বন’ প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য।

সমাজ বিবর্তনে অর্থনীতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অর্থনীতির আড়ালে থাকে সামাজিক মানুষের ওঠা নামা তথা ভাঙাগড়ার কাহিনি। এককথায় বলা যায় মানুষের জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থনীতির ভূমিকা প্রধান ও শেষ কথা। ১৯৬০-৮০ এই কালপর্ব আর্থ-সামাজিক দিক থেকে টানাপোড়নের সময়। কেননা স্বাধীনতার পর অনেকটা সময় কেটে গেলেও অবহেলিত কৃষি ও ক্রমবর্ধিত জনসংখ্যার কারণে খাদ্য সমস্যা দেখা দিয়েছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পের উপর প্রাধান্য দেওয়ায় কৃষি ক্ষেত্র দুর্বল হয়ে পড়েছিল। যার ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা গভীর সংকটের সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়। কৃষি ও শিল্পের নতুন করে সমন্বয়ের অভাবে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা চরমে পৌঁছে ছিল। এরপর ভারতবর্ষকে আবার দু-দুটো যুদ্ধ লড়তে হয় চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে। যেখানে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হল দেশকে। এর কিছু পরেই বাংলায় শুরু হয় নকশাল আন্দোলন। ফলে সেসময় মানুষের খাদ্য-বাসস্থান ও অস্তিত্বের সংকট তীব্রতর হতে থাকে। সেই সঙ্গে জমিদারের প্রভাব, জমিদারদের অত্যাচার মানুষের জীবনে দুরবস্থার সৃষ্টি করেছিল। এই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে রচিত মহাশ্বেতা দেবীর ‘বায়েন’, ‘বিছন’, ‘স্তনদায়িনী’, ‘ভাত’, ‘জল’, ‘নুন’, ‘দ্রৌপদী’, অসীম রায়ের ‘বদলি’, ‘হরিদ্বারের সন্ধ্যা’, ‘ভারতবর্ষ’, দেবেশ রায়ের ‘উদ্বাস্তু’, ‘দখল’, ‘দাহনবেলা’, ‘ক্ষুধায় জন্ম মৃত্যু’, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পলাতক ও অনুসরণকারী’, অমলেন্দু চক্রবর্তীর ‘রোহিতাশ্বের নামে’, দিব্যেন্দু পালিতের ‘শোকসভা’, সমরেশ বসুর ‘শহীদের মা’ প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। আবার তপোবিজয় ঘোষের দুই খণ্ডে রচিত

‘কালচেতনার গল্প’ একাধিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। ছোটগল্পের নিজস্ব পরিসরে তপোবিজয় ঘোষ শুধু তাঁর চারপাশের সাদা-কালোয় গড়া মানুষ সমেত সমাজটাকে নিজের মতো করে দেখেছেন তাই নয়, ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক প্রগতির পটভূমিতে স্থাপন করে নির্মাণ করতে চেয়েছেন তার প্রত্যাশা-বিষাদময় জটিল আলেখ্য। দুই খণ্ডে ‘কালচেতনার গল্প’ তারই সুবিদিত প্রতিনিধি। সংকলন গ্রন্থ দুটির চৌত্রিশটি গল্পে ছড়িয়ে আছে একজন বিবেকী বুদ্ধিজীবীর সময়-সমীক্ষণ এবং বিশ্বাসের সততা। নিবিষ্ট পাঠ শেষে আমাদের কৌতূহল ধাবিত হয় একেবারেই ভিন্ন এক লক্ষ্যের দিকে। আশ্চর্যের বিষয়, দুটি গল্পের সংকলনের ঠিক অর্ধেক গল্প অর্থাৎ সতেরোটি গল্প লেখা হয়েছে First Person Narrative-এ। এইসব গল্পের মধ্যে ‘আমি’ নামক একটি চরিত্র বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন বিন্যাসে কাহিনিতে অবস্থান করছে, যারা সাধারণত কাহিনির কথক। মোট কুড়িটি গল্পের সংকলন ‘কালচেতনার গল্প’ প্রথম খণ্ডতে এই রকম গল্প আছে দশটি। যেমন—‘কুণ্ডুবাবুর কুকুর, আমি এবং ভূতনাথ’, ‘প্রথম শ্রেণীর গল্প’, ‘একটি মস্তানীগল্পের ভূমিকা’, ‘উত্তরের জানালা’, ‘কাগজ ও কেরোসিন’, ‘শোভনের জন্য বিজ্ঞাপন’, ‘এমন এই সময়’, ‘নক্ষত্রের আলো’, ‘দরদামের গল্প’ ও ‘জীবনদীপ’। ‘কালচেতনার গল্প’ দ্বিতীয় খণ্ডের মোট চৌদ্দটি গল্পের মধ্যেও এই জাতীয় গল্পের সংখ্যা ঠিক অর্ধেক। যেমন—‘ভালোবাসার চালচিত্র’, ‘টুকুনবউ’, ‘একটি প্রাপ্তবয়স্ক গল্প’, ‘রক্ত বিষয়ক’, ‘ইতিহাস’, ‘খোঁয়াড়’ ও ‘থাকা না-থাকা’। আসলে এমনটাই ছিল তাঁর প্রিয় শৈলী।

দীপেন্দ্রনাথের গল্প ছিল দেশকাল চিহ্নিত। সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের কাল থেকে আমৃত্যু তিনি আমাদের গৌরবান্বিত ঐতিহ্য, দেশ ভাবনা, পুরাণ এবং বর্তমান জীবন ও সময়ের পিঠে হাত রেখেই সমাজজীবনের দ্বান্দ্বিকতা অনুভব করেছিলেন। সেজন্যই সাহিত্যে সেই অনুভূতিকে শিল্পরূপ দিতে চেয়েছেন। দেশকাল ছুঁয়ে, পরিপার্শ্বে চোখ রেখে, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও ছিন্নমূল মানুষের জীবনসংকটকে বুঝে নিতে নিতে তাঁর পথ চলা, গল্প বলা—এই ভাবেই দীপেন্দ্রনাথ রচনা করেছেন সাতটি গল্পের সংকলন। যেমন,

‘হওয়া না-হওয়া’, ‘ফুল ফোটার গল্প’ (১৯৬০), ‘অশোক বন’ (১৯৬১), ‘পরিপ্রেক্ষিত’ (১৯৬১), ‘তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা’ (১৯৬২), ‘নির্বাসন’ (১৯৬৩), ‘উৎসর্গ’ (১৯৬২), ‘হওয়া না-হওয়া’ (১৯৬৭)। প্রথম গল্পের সঙ্গে শেষ গল্পের ব্যবধান সাত বছর। প্রতিটি গল্পের অন্তঃসার আমাদের আলোড়িত করবে। এই গল্পগুলি রচনার কালে তাঁর চোখের সামনে ঘটে গিয়েছিল চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ, পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ভাগবিভাগ এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন।

ছোটগল্পে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের শিল্পদক্ষতা সাফল্যের শীর্ষ ছুঁয়েছে। তাঁর উত্থান ছোটগল্পের হাত ধরেই। তাঁর রচিত ‘ধানপোকা’, ‘কানিবোষ্টমীর গঙ্গাযাত্রা’, ‘অন্নদাতা’, ‘দ্রৌপদী’, ‘অন্নসত্র’, ‘এক আঁজলা জল’, ‘চোর’, ‘জলপথ’, ‘কালো জল’, ‘সহবাস’, ‘দধীচির হাড়’, ‘কালবেলা’ এবং আরো অসংখ্য গল্প আমাদের নতুন নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। গল্পের বক্তব্যে জীবনের নানান অর্থ অনুসন্ধানের অনুশীলন চলতে থাকে। আবার মতি নন্দী রচিত ‘পর্দার নীচে একজোড়া পা’, ‘শবাগার’ ‘বুড়ো এবং ফুচা’, ‘ফুলদানি’, ‘একটা খুনের খবর’, ‘বৃষ্টিতে’, ‘গলিত সুখ’, ‘কপিল নাচছে’ প্রভৃতি গল্পগুলো সত্তর দশকের প্রেক্ষাপট নিয়ে লেখা অসামান্য গল্প।